বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি : আমার কিছু কথা

ড. এস এম ইমামুল হক
উপাচার্য, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে বরিশালের বেলস পার্কে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু উদ্যান) এক জনসভায় দক্ষিণবঙ্গে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে ২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশালের কর্ণকাঠিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যার হাত ধরেই শুরু হয় বরিশালবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ও বঙ্গবন্ধুকন্যার দ্বারা স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে কিছু লিখতে বসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। অপেক্ষাকৃত নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় ছিল হাজারো সীমাবদ্ধতা। সব প্রতিবন্ধকতা পেছনে ঠেলে স্বল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজাকার, মাদক, ধূমপান ও র‍্যাগিংমুক্ত ক্যাম্পাস ঘোষণা করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীরা যাতে মাথা তুলতে না পারে, সেই জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছি। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এতে নানা সময়ে বিরূপ আচরণ করেছে। কিন্তু আমি পিছপা হইনি।

সম্প্রতি মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট। ২৫শে মার্চ নানা আয়োজনের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাঁরা বর্ণনা করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অংশ নেওয়ার গৌরবগাঁথা। সন্ধ্যায় শহীদ মিনারে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বাইরে হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি ছিল। অথচ সব অনুষ্ঠান ছিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত।

পরদিন ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ও ছাত্রছাত্রীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সব ছাত্র ও ছাত্রী হলে ছিল বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা। কেবল বিকেলের আয়োজনটা ছিল শিক্ষক-কর্মকর্তা-সুধীজন ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে। বছরে কেবল এই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শিক্ষক-কর্মকর্তা ও এই অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে। এই চা চক্রে ভারী খাবারও থাকে না, যে ধরনের খাবার একই দিন পরিবেশন করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ এই চা চক্রে অংশগ্রহণের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করল। তাৎক্ষণিকভাবে আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে চা চক্র আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের বাধার মুখে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবসের এ আয়োজন পণ্ড হলো। আমন্ত্রিত অতিথিরা এসে ফিরে গেলেন। শিক্ষকরা-কর্মকর্তারা পরিবারসহ অনুষ্ঠানে এসে কিছু ছাত্রছাত্রীদের বাধার মুখে অংশ নিতে পারলেন না। এই অনুষ্ঠানকে পণ্ড করে অপমান করা হলো আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের।

এখানেই শেষ নয়, ২৭শে মার্চ ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলনকারীরা একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিল। রাত সোয়া নয়টা পর্যন্ত আটকে রাখল অর্ধশত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের। অনেকেই ছিলেন অভুক্ত, অনেক অনুরোধের পরও তাঁদেরকে বের হতে দেওয়া হলো না। অনেক দফা আলোচনার পর অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেও কী অবর্ণনীয় কষ্ট পেয়েছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা, সেটি ভাবতেই বুক ভারী হচ্ছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লজ্জাজনক ঘটনা। এমন কালো রাত যেন দক্ষিণবঙ্গের এই স্বপ্নের বিদ্যাপীঠে ফিরে না আসে, এটি আমার একান্ত প্রত্যাশা।

আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসসহ সব অনুষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মকর্তা-ছাত্রছাত্রী সবার জন্যই থাকে একই খাবারের ব্যবস্থা, সব আয়োজনই থাকে সবার জন্য উন্মুক্ত। অথচ মহান স্বাধীনতা দিবসে আন্দোনকারী ছাত্ররা শিক্ষকদের সমান অধিকারের দাবি তুলল! পহেলা বৈশাখ, আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পিঠা উৎসবসহ সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই। এ ছাড়া প্রতিটি বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বনভোজন, আনন্দভ্রমণ, শিক্ষাসফরের আয়োজন করে। প্রায় সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে ছাত্রছাত্রীরাই। ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবলসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরাই অংশ নেয়, সেখানে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য কোনো ইভেন্ট থাকে না। বিতর্ক উৎসব বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শুধু

ছাত্রছাত্রীরাই। বিভিন্ন বসন্ত বরণ উৎসব, নজরুল জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তীসহ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সব অনুষ্ঠানে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সময়ে যেসব বইমেলা হয়েছে, প্রতিটির আয়োজনে ছিল ছাত্রছাত্রীরা। বিভিন্ন বিভাগের দেয়ালিকা ভরে উঠে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল লেখা ও আঁকায়। রোভার স্কাউট, বিএনসিসিসহ বিভিন্ন সংগঠন ও ক্লাব পরিচালিত হয় ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাই। বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই। ২৬শে মার্চ শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা অংশ না নিলে তাদের এমন কি ক্ষতি হতো?

শিক্ষক, কর্মকর্তা, বিশিষ্টজন ও সাংবাদিকদের সম্মানে চা-চক্রের আয়োজনে ছাত্রদের কোনো বছরই অংশগ্রহণ থাকে না। এতে অংশগ্রহণের কোনো দাবিও এর আগে তারা আমার কাছে উত্থাপন করেনি। হঠাৎই এ বছর তারা আন্দোলন শুরু করে। তাদের না রাখা হলে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হবে না–কিছু শিক্ষার্থী এ ধরনের হুমকি দিয়ে আসছিল। আমার প্রশ্ন হলো, শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া থাকতে পারে, কিন্তু সেটা স্বাধীনতা দিবসের মতো একটি বিশেষ দিনে তোলা হলো কেন? ঠুনকো একটি বিষয় নিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের প্রবেশদ্বারে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরীক্ষা, ক্লাস–কোনোকিছুতেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অংশ নিতে দেয়নি তারা। এতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি আন্দোলনকারীরা, শিক্ষক ও প্রশাসনের নামে উদ্ধত্বপূর্ণ স্লোগানও দিতে থাকে। একই দিনে ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভার রুমে অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা। সাধারণ ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই।

স্বাধীনতা দিবসে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (বিইউডিএস) আয়োজিত আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের সময় আমি বলেছি, যারা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান করতে দিয়ে চায় না, তারা স্বাধীনতার পক্ষে বলে মনে হয় না। তাদের আচরণ রাজাকারসদৃশ। সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি এই বক্তব্য দিইনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানও তো রয়েছে। আমার কথা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের খেপিয়ে তোলা হচ্ছে। এর পেছনে স্বাধীনতাবিরোধীদের হাত আছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি ছিল, ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী ও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছি। আমার বক্তব্য ছিল, '২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমার প্রদত্ত বক্তব্যের একটি বাক্যকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রাজাকার সম্বোধন করিনি বরং বলেছি, যারা মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের এহেন কার্যক্রম রাজাকার সদৃশ। ওই শব্দটি আমি কোনোভাবেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলিনি। এরপরও যদি আমার ওই বক্তব্যে কোনো শিক্ষার্থী মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার স্বার্থে আমি সব শিক্ষার্থীর সহযোগিতা কামনা করছি।'

দুঃখ প্রকাশ করার পরও কেন আন্দোলন চলছে? এর পেছনে কারা ইন্ধন যোগাচ্ছে, এটি অনেকটাই স্পষ্ট। চা চক্রে শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ না জানানোকে ইস্যু করে পরিকল্পিতভাবে এই আন্দোলন সাজানো হয়েছে। আমার ধারণা, শুরু থেকেই এই পরিকল্পিত আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে স্বাধীনতাবিরোধী একটি গোষ্ঠী। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট হাজার ছাত্রছাত্রী আছে, অথচ আন্দোলন করছে মাত্র এক-দেড়শ ছাত্রছাত্রী। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভুল তথ্য দিয়ে, নানা প্রগাপাণ্ডা ছড়িয়ে আন্দোলনে টানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এতেই স্পষ্ট, এটি সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন নয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে আমার আহ্বান, তোমরা ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছ না, এতে তোমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তাই, এ বিষয়ে তোমাদের ইতিবাচক পদক্ষেপ বদলে দিতে পারে সার্বিক পরিস্থিতি।

আমি আবারও বলছি, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। তোমরা শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, খেলাধুলা, বিতর্ক, কীর্তিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বয়ে আনবে, এ আমার বিশ্বাস। শিগগির এই অচলাবস্থার অবসান হয়ে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হবে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস–এই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।